যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কত প্রকার (Types of Computer Network) ও কি কি? বিস্তারিত লিখুন।
২. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) কী?
৩. LAN কী? LAN এর বিভিন্ন প্রকার টপোলজির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৪. OSI Model কী? OSI Model এর Layer গুলো বর্ণনা করুন।
৫. ব্লু-টুথ (Bluetooth) টেকনোলজি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. প্যাকেট সুইচিং এবং সার্কিট সুইচিং- এর উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৭. ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) ও ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-MAX) বলতে কি বোঝায়? এদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।
৮. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করুন।
৯. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলতে কী বোঝায়? এর প্রকারভেদগুলো লিখুন।
১০. নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি বলতে কী বোঝায়? গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির বর্ণণা দিন।

CLASS WORK Information Technology

- Computer Network
- Network Architecture/Topology
- OSI Layers
- PAN, LAN, MAN and WAN
- Network Devices

STUDENT STUDY Computer Network

০১. কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking) কী?

পাশাপাশি বা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ও রিসোর্স শেয়ারের জন্য স্থাপিত অর্ন্তসংযোগ বিশিষ্ট সমন্বিত ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত রির্সোস শেয়ার করা। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রিসোর্স সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **হার্ডওয়্যার রিসোর্সের শেয়ার:** নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটারের জন্য অন্য কম্পিউটারের কোন হার্ডওয়্যার উপাদান হচ্ছে হার্ডওয়ার রিসোর্স। যেমন- একটি অফিসে সবাই মিলে একটি প্রিন্টার ব্যবহার করা।
২. **সফটওয়ার রিসোর্স শেয়ার:** নেটওয়ার্কভুক্ত একটি সফটওয়্যারকে সকল কম্পিউটারে ব্যবহার করাই সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার।
৩. **ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ার:** নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটার থেকে অন্য কোন কম্পিউটারের ফাইল/ডেটা অথবা ইনফরমেশন অ্যাকসেস করাই হচ্ছে ইনফরমেশন রিসোর্স শেয়ার।

এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হলো–

তথ্য সংরক্ষণ করা, তথ্য বিতরণ করা, মেসেস বা ই-মেইল আদান-প্রদান করা, ইত্যাদি।

০২. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কত প্রকার (Types of Computer Network) ও কি কি? বিস্তারিত লিখুন।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ (Types of Computer Network):

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যথা–

- **মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ:**
  - ক) প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network) ও
  - খ) পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network)।

ক) **প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (Private Network):** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক মালিকানাধীন নেটওয়ার্ককে privet network বলা হয়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। যেমন– বিভিন্ন ব্যাংকের নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

খ) **পাবলিক নেটওয়ার্ক (Public Network):** যে ধরনের নেটওয়ার্ক সবাই ব্যবহার করতে পারে তাকে public network বলে। এ ধরনের নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন- ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ইত্যাদি।

- নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ভিত্তিক নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম প্রদানের ধরনের ওপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ক-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
  1. সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network)।
  2. ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network) ও
  3. হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network)।

১) সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক (Centralized Network):

একটি প্রধান বা হোস্ট বা মেইনফ্রেম কম্পিউটার এবং কতিপয় টার্মিনাল নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে সেন্ট্রালাইজড নেটওয়ার্ক বলে। প্রধান কম্পিউটারই সকল প্রসেসিং এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে। এখানে টার্মিনাল বলতে এক ধরনের হার্ডওয়্যার বুঝায় যা কী-বোর্ড ও মনিটর নিয়ে গঠিত। ব্যবহারকারী টার্মিনালের সাহায্যে হোস্ট কম্পিউটারে সংযুক্ত হয়ে সার্ভিস গ্রহণ করে থাকে।

টার্মিনাল: দুই ধরনের হতে পারে। যেমন–

১. **ডাম্ব টার্মিনাল (Dumb Terminal):** ডাম্ব টার্মিনালে কোন মেমরি ও স্টোরেজ নেই। এছাড়া এ টার্মিনালে প্রসেসিং ক্ষমতাও নেই।

২. **ইন্টিলিজেন্ট টার্মিনাল (Intelligent Terminal):** ইন্টিলিজেন্ট টার্মিনালের সীমিত মেমরি ও স্টোরেজ ক্ষমতা আছে। এ টার্মিনালেরও প্রসেসিং ক্ষমতা নেই।

২) ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক (Distributed Network):

কিছু ওয়ার্কস্টেশন বিভিন্ন শেয়ার স্টোরেজ ডিভাইস এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস নিয়ে এ নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। এ নেটওয়ার্কের প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশনের নিজস্ব মেমরি, স্টোরেজ ও প্রসেসিং ক্ষমতা রয়েছে। যার ফলে এগুলো লোকালি কাজ করতে পারে।

৩) হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybrid Network):

স্টার, রিং, বাস, ইত্যাদি নেটওয়ার্কে সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলে। যেমন- ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড নেটওয়ার্ক।

ভৌগলিক বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Personal Area Network-PAN)।

২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN)।

৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Network-MAN) এবং

৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)।

১) পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক **(Personal Area Network-PAN):**

কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে PAN বলে। উদাহরণ- Laptop, PDA বহনযোগ্য, প্রিন্টার, মোবাইল ইত্যাদি।

PAN-নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ফ্রিকোয়েন্সি সীমা (১-১০) মিটার।
- সহজে যে কোন স্থানে এই নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়।
- খরচ কম।
- Noise দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
- দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায়।
- ফ্রিকোয়েন্সির বাইরে গেলে ট্রান্সমিশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ইত্যাদি।

২) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক **(Local Area Network-LAN):**

একই ভবনে, পাশাপাশি ভবনে কিংবা একই ক্যাম্পাসের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাকে local area network বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ডিভাইসগুলোর মধ্যে রিসোর্স শেয়ার করা। যেমন- কোন অফিসে LAN তৈরি মাধ্যমে সবাই একটি প্রিন্টার শেয়ার করা।

LAN- নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ফ্রিকোয়েন্সি সীমা (১০-১০০) মিটার।
- LAN স্থাপন করা সহজ।
- খরচ কম।
- কাজের গতি দ্রুত বৃদ্ধি করণ।
- ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি উপযোগি।
- ডেটা ট্রান্সফার রেট সাধারণ।
- সহজেই ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদি।

৩) মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক **(Metropolitan Network-MAN):**

একটি শহরের বিভিন্ন স্থাপনের কম্পিউটারের মধ্যে যে সংযোগ তাকে metropolitan network বলে। MAN তৈরি হয় এক বা একাধিক local area network (LAN) এর সমন্বয়ে। সাধারণত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা অফিসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এ ধরনের নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

MAN-নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ফ্রিকোয়েন্সি সীমা (৫-৫০) কি.মি।
- তুলনামূলক বেশি পরিমাণ রিসোর্স শেয়ার করা যায়।
- খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতি সম্পন্ন।
- একাধিক LAN যুক্ত হয়ে MAN গঠিত হয়।
- ডেটা ট্রান্সফার রেট Mbps-Gbps, ইত্যাদি।

৪) ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক **(Wide Area Network-WAN):**

এ ধরনের নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলো বিশাল জায়গা জুড়ে থাকে এটা হতে পারে একই দেশের বিভিন্ন শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পর্যন্ত।

WAN-এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- WAN গুলো LAN এর চেয়ে ধীর গতির।
- কম খরচে VoIP (Voice over Internet Protocol) এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে কথা বলা যায়।
- অনলাইন শপিং করা যায়।
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হয়।

- বুলেটিং বোর্ড, ই-ল্যানিং, রির্জাভেশন, ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়।

০৩. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing) কী?

ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing): ইন্টারনেটে বা ওয়েবে সংযুক্ত হয়ে কিছু গ্লোবাল সুবিধা যেমন- কম্পিউটিং শক্তি, অনলাইনল পরিসেবা, ডেটা অ্যাকসেস, ডেটা সোর্স, ইত্যাদি ভোগ করার যে পদ্ধতিই ক্লাউড কম্পিউটিং।

➘ ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ- তিনটি

১. রিসোর্স স্কেলেবিলিটি (Resource Scalability)
২. অন-ডিমান্ড (On Demand) ও
৩. পে-অ্যাজ-ইউ-গো (Pay As You Go)।

➘ ক্লাউড কম্পিউটিং এর সার্ভিস মডেল– তিনটি।

১. অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a Service-Iaas)
২. প্লাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a service -PaaS) and
৩. সফটওয়্যার সেবা (Software as a service-Saas)।

➘ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর প্রকারভেদ: সাধারণত চার প্রকার। যথা-

১. পাবলিক ক্লাউড (Public Cloud)
২. কমিউনিটি ক্লাউড (Community Cloud)
৩. প্রাইভেট ক্লাউড (Privet Cloud) ও
৪. হাইব্রিড ক্লাউড (Hybrid Cloud)।

০৪. LAN কী? LAN এর বিভিন্ন প্রকার টপোলজির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩৭তম, ৩৬তম বিসিএস)

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN: স্বল্প পরিসরের জায়গায় অর্থাৎ ১০-১০০ মিটার বা তার কম এরিয়ার মধ্যে কিছু সংখ্যক কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্য কোন পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন-প্রিন্টার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে।

➘ নেটওয়ার্ক সংগঠন (Network Topology/Architecture)

নেটওয়ার্ক সংগঠন বলতে এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারের পারস্পারিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বুঝায়।
অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে নেটওয়ার্ক সংগঠন (network topology/architecture) বলে। উল্লেখযোগ্য কতিপয় topology হলো–

১. বাস টপোলজি (Bus Topology)
২. রিং টপোলজি (Ring Topology)
৩. স্টার টপোলজি (Star Topology)
৪. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
৫. মেশ টপোলজি (Completely Interconnected Topology) ও
৬. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)।

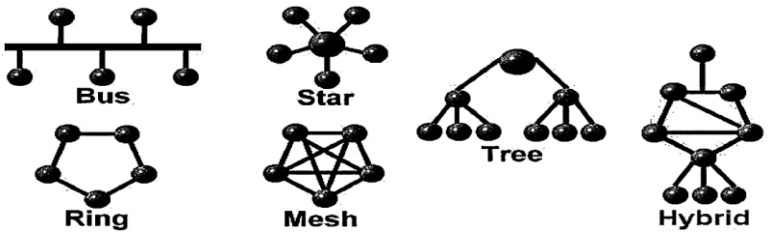

▪ বাস টপোলজি (Bus Topology)

যে টপোলজিতে একটি মূল ক্যাবলের সাথে সব কয়েকটি ওয়ার্কস্টেশন (work station-WS) বা কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি বলে। একে লিনিয়ার বাস বা লাইন টপোলজিও বলা হয়। আর মূল ক্যাবল বা তারকে ব্যাকবোন (backbone) বলা হয়। তারটির উভয় প্রান্তে টারমিনেটর ব্যবহার করা হয়।

➘ বাস টপোলজির বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- লাইনের সংখ্যা কম।
- খরচ কম।
- কোন কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে অন্যটির কাজে কোন অসুবিধা হয় না।
- রিপিটার ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের ব্যাকবন সম্প্রসারণ করা যায়।
- মূল ক্যাবল নষ্ট হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক সিস্টেম অচল হয়ে যায়।
- একই সময়ে একটি কম্পিউটার লাইনটি ব্যবহার করতে পারে।
- নেটওয়ার্কের performance তেমন ভালো নয়।
- তুলনামূলক ব্যয়বহুল, ইত্যাদি।

▪ রিং টপোলজি (Ring Topology)

কম্পিউটারগুলো বৃত্তাকার পথে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যে টপোলজি গড়ে তোলে তাকে রিং টপোলজি বলে। এটা একমুখী প্রবাহের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করে। এখানে কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না। প্রত্যেকটি কম্পিউটার স্বাধীন।

➘ রিং টপোলজির বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এ পদ্ধতিতে সাধারণত কোন সার্ভার প্রয়োজন হয় না।
- সব কম্পিউটারই সমান গুরুত্ব পায়।
- কনফিগারেশন সহজ।
- নোডের পরিমাণ বেশি হলেও performance ভাল থাকে।
- সরাসরি কোন নোডে সংকেত পাঠাতে পারে না।
- নোডের সংখ্যা বাড়লে ট্রান্সমিশন সময় বেড়ে যায়।
- যে কোন নোড নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেমই অকেজো হয়ে পড়ে।
- সহজেই ভাইরাস ছড়ায়, ইত্যাদি।

▪ স্টার টপোলজি (Star Topology)

যে টপোলজিতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ষ্টার টপোলজি বলে। এই টপোলজিতে হাব বা সুইচ কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

➘ স্টার টপোলজির বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- যে কোন সময় নতুন নোড যুক্ত করা যায়।
- LAN তৈরিতে এই টপোলজি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।***
- নতুন নোড যুক্ত করলেও ট্রান্সমিশনের সময় একই থাকে।
- কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।
- কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি অকেজো হয়ে যায়।
- খরচ বেশি লাগে।
- কোন নোড নষ্ট হলেও নেটওয়ার্ক সিস্টেম ঠিক থাকে, ইত্যাদি।

▪ **মেশ টপোলজি (Mash Topology)**

যে টপোলজিতে প্রত্যেকটি কম্পিউটার বা নোড প্রত্যেকটির সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে তাকে মেশ টপোলজি বলে। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি নোডই সরাসরি যে কোন নোডের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কভৃক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সংযোগকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট (P2P) লিংক বলে। এই টপোলজিকে আবার Fully Interconnected Topology ও বলা হয়।

➘ মেশ টপোলজির বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- যে কোন নোড যে কোন সময় যে কোন নোডে সরাসরি কমিউনিকেশন করতে পারে।
- ট্রান্সমিশন গতি অত্যন্ত দ্রুত।
- যে কোন নোড নষ্ট হয়ে গেলেও নেটওয়ার্ক সিস্টেম সচল থাকে।
- অবকাঠামো অনেক শক্তিশালী।
- ডেটা আদান প্রদানে দক্ষতা ও নিশ্চয়তা বেশি।
- কনফিগারেশন জটিল।
- খরচ অনেক বেশি।
- কেবলিং খরচ বেশি।
- এই পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য খরচ অনেক বেশি পড়ে, ইত্যাদি।

▪ **ট্রি টপোলজি (Tree Topology)**

যে টপোলজিতে একটি সার্ভার কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারগুলো স্তরে স্তরে সংযুক্ত থাকে তাকে ট্রি টপোলজি বলে। বিভিন্ন স্তরের কম্পিউটারগুলো হাব বা সুইচের মাধ্যমে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল হোস্ট বা রুট কম্পিউটার শক্তিশালী হতে হয়।

➘ ট্রি টপোলজির বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- অফিস অ্যাডমিনিস্টেশনের জন্য অধিক উপযোগি।
- নতুন নোড সংযোগ করা বা বাদ দেওয়া সহজ।
- রুট কম্পিউটার বিকল হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কই অচল হয়ে পড়ে।
- কনফিগারেশন জটিল ধরনের, ইত্যাদি।

▪ **হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)**

একাধিক টপোলজি অর্থাৎ স্টার, রিং, বাস, ইত্যাদি টপোলজির সমন্বয়ে গঠিত হয় হাইব্রিড টপোলজি।
যেমন- ইন্টারনেট একটি হাইব্রিড টপোলজি।

***এই টপোলজির বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা ঐ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টপোলজির উপর নির্ভর করে।

০৫. নেটওয়ার্ক ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি (Network Device)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ছাড়াও আরো অনেক ধরনের আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার এর সাথে অন্য একাধিক কম্পিউটারের সংযোগ করার জন্য যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে নেটওয়ার্ক ডিভাইস বলা হয়। কতিপয় নেটওয়ার্ক ডিভাইস নিম্নরূপ-

- নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC)
- মডেম (Modem)
- Hub (হাব)
- রিপিটার (Repeater)
- ব্রিজ (Bridge)
- রাউটার (Router)
- গেটওয়ে, ইত্যাদি।

▪ **নেটওয়ার্ক ই**

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডকে LAN কার্ড বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কার্ডও বলা হয় যা মাদারবোর্ড এর এক্সপানশন স্লটে লাগানো থাকে। NIC মূলত মডেমের কাজ করে তাই একে ইন্টারনাল মডেম ও বলা হয়। এই কার্ডকে সক্রিয় করতে উপযুক্ত সফটওয়্যার ইন্সটল করতে হয়।

➘ NIC এর গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ–

- নেটওয়ার্ক থেকে ডেটা প্যাকেট গ্রহণ করে।
- ডেটা প্যাকেটে ম্যাক এড্রেস যোগ করে।
- ডেটা প্যাকেট ফরমেট পরিবর্তন করা।
- ট্রান্সমিট করা প্যাকেটকে ইলেকট্রিক্যাল, লাইট কিংবা Radio signal এ পরিণত করা।
- ট্রান্সমিটের সাথে ফিজিক্যাল কানেকশন তৈরি করে, ইত্যাদি।

▪ মডেম (Modem)

মডেম হলো একটি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র যা ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে এবং এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করে।
মডেমের গতি সাধারণত (৩০০-৫৭৬০০)bps হয়ে থাকে।

➘ মডেমের দুইটি অংশ থাকে। যথা-

১. **মডুলেটর (Modulator):** যা ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তর করে। আর এই রূপান্তর ক্রিয়াকে মডুলেশন বলা হয়।

২. **ডি-মডুলেটর (De-Modulator):** যা এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে। আর এই রূপান্তর ক্রিয়াকে ডি-মডুলেশন বলে।

কম্পিউটারে সাধারণত দুই ধরনের মডেম ব্যবহার হয়। যথা-

১. এ্যাকুস্টিক কপালার মডেম ও
২. সরাসরি সংযুক্ত মডেম।

➘ মডেম এর কাজসমূহ-

- তথ্য আদান প্রদান করা।
- সংকেত পরিবর্তন করা, ইত্যাদি।

▪ হাব (Hub)

যে যন্ত্রের মাধ্যমে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত কম্পিউটারের মধ্যে তার দিয়ে লোকাল এরিয়া (LAN) নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়, তাকে হাব বলে। হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। ষ্টার টপোলজিতে হাব একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

➘ কার্যকারিতার ভিত্তিতে: হাব দুই প্রকার। যথা–

ক) **সক্রিয় হাব (Active Hub):** যে হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে এবং মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে তাকে Active Hub বলে। সক্রিয় হাব সংকেতকে স্বল্প মাত্রায় প্রসেসও করে থাকে। এ জাতীয় অধিক ক্ষমতাযুক্ত হাবকে ইন্টেলিজেন্ট হাব বলা হয়।

খ) **নিষ্ক্রিয় হাব (Passive Hub):** যে হাব সংকেতের মান বৃদ্ধি করে না, শুধুমাত্র সংকেত আদান প্রদান করতে সহায়তা করে, তাকে নিষ্ক্রিয় হাব বলে। এজন্য এ হাবকে কোন একটিভ ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

➘ হাবের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এটা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসকে যুক্ত করতে পারে।
- দামে সস্তা।
- এটা নেটওয়ার্কে ট্রাফিক জ্যাম বৃদ্ধি করে।
- ডেটা কলিউশনের সম্ভবনা থাকে।
- ডেটা ফিল্টারিং করা সম্ভব হয় না, ইত্যাদি।

▪ সুইচ (Switch)

সুইচ হলো বহুপোর্ট বিশিষ্ট কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা তথ্যকে প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। সুইচ ও হাবের কাজ প্রায় একই।

*** হাবে প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করার পর একই সাথে সংযুক্ত সকল কম্পিউটারে পাঠায়, কিন্তু সুইচ তা শুধু টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।

➘ সুইচের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ভার্চুয়াল ল্যান ব্যবহার করে ব্রডকাষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- হাবের চেয়ে ডেটা ট্রান্সমিশন স্প্রিড অনেক বেশি।
- এতে ডেটা কলিউশনের সম্ভবনা কম থাকে।
- হাবের তুলনায় দাম বেশি।
- কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল, ইত্যাদি।

০৬. রাউটার (Router) [৩৮তম বিসিএস]

এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে রাউটিং বলে। রাউটিং এর জন্য যে হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাকে রাউটার বলে। ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করার জন্য এ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। এটি LAN, MAN এবং WAN এ তিন ধরনের নেটওয়ার্কেই কাজ করে।

➘ রাউটারের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ডেটার কলিউশন সম্ভবনা কমায়।
- ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ক যেমন ইন্টারনেট, টোকেন, রিংকে সংযুক্ত করতে পারে।
- ব্রডকাস্ট ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়।
- নেটওয়ার্কের অ্যাড্রেস সংগ্রহ করে রাখতে পারে।
- তুলনামূলক দাম বেশি ও ধীরগতি সম্পন্ন।
- কনফিগারেশন জটিল।
- একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক ছাড়া সংযুক্ত করতে পারে না, ইত্যাদি।

▪ গেটওয়ে (Gateway)

গেটওয়ে হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস যা বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্কগুলোকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কাজ করে। গেটওয়ে ও রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়।

➘ গেটওয়ের বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ডেটা কলিউশন সম্ভবনা কমায়।
- বিভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
- ট্রান্সমিশনে বাধা কমায়।
- তথ্যের ফিল্টারিং ও নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- ধীরগতি সম্পন্ন।
- কনফিগারেশন তুলনামূলক জটিল, ইত্যাদি।

০৭. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Data Transmission Method)

ডেটা স্থানান্তর হয় সিগন্যাল বিটের মাধ্যমে। ডেটা আদান প্রদানের জন্য প্রেরক ও প্রাপক উভয় কম্পিউটারকে সিগন্যাল বিটের শুরু বুঝতে হয়। সিগন্যাল বিটের শুরু এবং শেষ বুঝার জন্য ব্যবহৃত ব্যবস্থা হল সিনক্রোনাইজেশন। সিনক্রোনাইজেশন ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. এসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission) ও
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)।

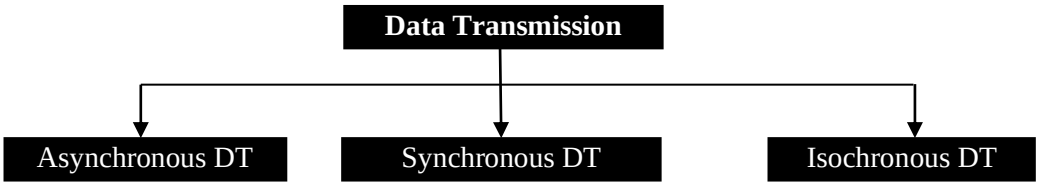

ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড

০৮. ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। এটা তিন প্রকার। যথা–

১. ইউনিকাস্ট (Unicast)
২. মাল্টিকাস্ট (Multicast) ও
৩. ব্রডকাস্ট (Broadcast)।

১। ইউনিকাস্ট (Unicast): দুইটি নোডের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান। ইউনিকাস্ট পদ্ধতিতে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) **সিমপ্লেক্স (Simplex):** একমুখী ডেটা প্রবাহ।

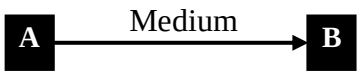

ব্যবহার-

- TV, Radio, PABX system।

খ) **হাফ-ডুপ্লেক্স (Half-Duplex):** ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উভয় দিকে ডেটা প্রবাহ।

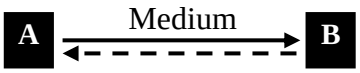

ব্যবহার-

- ওয়াকি-টকি (Walkie-Talkie)।

গ) **ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex):** একই সময়ে উভয় দিয়ে ডেটা প্রবাহ।

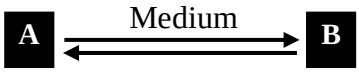

ব্যবহার-

- টেলিফোন।
- মোবাইল, ইত্যাদি।

২। ব্রডকাস্ট (Broadcast):

কোন একটি নোড থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা তার অধিস্থ সকল নোডই গ্রহণ করে।

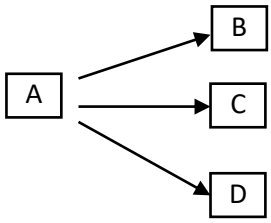

ব্যবহার-

- রেডিও।
- টেলিভিশনের সম্প্রচার, ইত্যাদি।

৩। মাল্টিকাস্ট (Multicast):

মাল্টিকাস্ট নেটওয়ার্কের কোন একটি নোড থেকে data প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধিস্থ সকল নোডই গ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র যে নোডকে অনুমতি দেওয়া হয় সেই নোডই গ্রহণ করতে পারে।

উদাহরণ: মোবাইল, ভিডিও কনফারেসিং, ইত্যাদিতে।

০৯. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহ (Medium of Data Communication)

যার মাধ্যমে ডেটা একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়াকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. তারযুক্ত (Cable) মিডিয়া ও
২. তারবিহীন মিডিয়া (Wireless Media)।

↘ তারযুক্ত মাধ্যম (Cable):

বিভিন্ন প্রকারের তার মাধ্যম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো–

ক) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable)
খ) কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-Axial Cable) ও
গ) ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)।

ক) টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted Pair Cable): দুটি পরিবাহী তামার তারকে পরস্পর সুষমভাবে পেঁচিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

↘ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- খরচ খুবই কম।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে।
- এটা ইনস্টল করাও সহজ।
- ৪ জোড়া বা ৮টি তার থাকে।
- ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে তথ্য প্রেরণ করা যায় না।
- দূরত্ব বাড়লে ট্রান্সফারের হার কমতে থাকে।
- ট্রান্সমিশন লস অনেক বেশি, ইত্যাদি।

↘ ব্যবহার-

- টেলিফোন লাইনে।
- ডিজিটাল সিগনালিং এ।
- LAN এর ক্ষেত্রে, ইত্যাদিতে।

****** 10Mbps-1Gbps***

খ) কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Co-axial Cable): কো-এক্সিয়াল ক্যাবল এটি দুইটি সুপরিবাহী ও দুইটি অপরিবাহী পদার্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

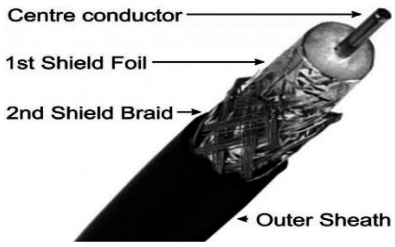

➘ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- অধিক নিরাপদ ও দামে সস্তা।
- অধিক দূরত্বে data প্রেরণ করা যায়।
- সহজে স্থাপন করা যায়।
- অধিক গতিতে ডেটা প্রেরণ।
- ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম।
- সহজেই ইস্টল করা যায়।
- রিপিটার ছাড়া ১ কি:মির বেশি দূরত্বে data প্রেরণ করা যায়।
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল অপেক্ষা কিছুটা ব্যয়বহুল, ইত্যাদি।

➘ ব্যবহার-

- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের (LAN) জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ক্যাবল টিভি সিস্টেম, ইত্যাদিতে।

গ) **ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable):** ফাইবার অপটিক ক্যাবল একগুচ্ছ স্বচ্ছ নমনীয় কাঁচতন্তু দিয়ে তৈরি।

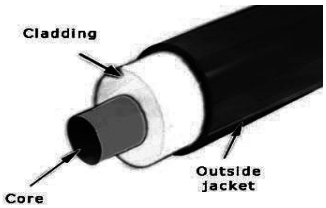

ফাইবার অপটিক ক্যাবলে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে । যথা-

i) Core ii) Cladding and iii) Outer Jacket।

➘ ফাইবার অপটিক ক্যাবল এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইথ 100Mbps-2Gbps পর্যন্ত হয়।
- আলোক তরঙ্গ ব্যবহার করে।
- EMI (electro-magnetic interference) নেই। তাই সবখানে ব্যবহার করা যায়।
- উচ্চ ব্যন্ডউইথ সম্পন্ন।
- নির্ভুল ডেটা আদান-প্রদান ও নিরাপদ বেশি।
- ইনস্টল করা খুব কঠিন।
- দাম বেশি ও maintenance cost বেশি, ইত্যাদি।

তারহীন মাধ্যম (Wireless Medium):

দুই বা ততোধিক ডিভাসের মধ্যে কোন প্রকার ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যমকে wireless medium বলে। এই পদ্ধতির সিগন্যালটিকে ব্রডকাস্ট করা হয় এবং যে কোন ডিভাইস সেটাকে গ্রহণ করতে পারে।

➘ তারবিহীন তিন ধরনের মাধ্যম হচ্ছে–

১. **ইনফ্রারেড (Inferred):** এটা এক ধরনের ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মিডিয়া, যা লাইট বিমের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট করে থাকে। এই প্রযুক্তিতে দুই প্রান্তে ট্রান্সমিটার ও রিসিভার থাকে। ফ্রিকোয়েন্সি সীমা (Hz-THz)

২. **মাইক্রোওয়েব (Microwave):** এটা হাইফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েব, যা সেকেন্ডে ১ গিগা বা তার চেয়ে বেশি কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি সীমা 300Hz-30Ghz। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে data স্থানান্তরের কাজে মাইক্রোওয়েব ব্যবহৃত হচ্ছে

৩. **রেডিও ওয়েব (Radio Wave):** ইনফ্রারেড সিগন্যালের চেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক ধরনের তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ হচ্ছে রেডিও ওয়েব। এটি আলোর গতিতে চলতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি সীমা 3KHz-1GHz। এই সীমার মধ্যকার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় radio frequency। এই সিগন্যাল সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না। এটার শক্তি নির্ধারিত হয় এন্টেনা ও ট্রান্সসিভারের মাধ্যমে।

➘ রেডিও ওয়েব এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- রেডিও ওয়েব ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভরশীল।

- এর শক্তি নির্ধারিত হয় এন্টেনা ও ট্রান্সসিভারের ওপর।
- ট্রান্সমিশন লস ও EMI (Electro-Magnetic Interference) সমস্যা বিদ্যমান।
- এতে বহুদূরত্বে ডেটা সহজে জেনারেট করা যায়, ইত্যাদি।

১০. ওয়্যারলেস ইন্টারনেট অ্যাকসেস পয়েন্ট (Wireless Internet Access Point)

Wireless networking এর ক্ষেত্রে যে সীমার ভিতর পয়েন্টে নেটওয়ার্কে অ্যাকসেস করা যায় তাকে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট অ্যাকসেস পয়েন্ট বলে।

➘ ইন্টারনেট অ্যাকসেস পয়েন্ট দুই ধরনের। যথা–

ক) হটস্পট (Hotspot) এবং
খ) মোবাইল নেটওয়ার্ক (Mobile Network)।

ক) হটস্পট (Hotspot):

এটা এক ধরনের ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস পয়েন্ট যা দ্বারা মোবাইল, ল্যাপটপ ও বিভিন্ন ডিভাইসে নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে থাকে।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তিনটি হটস্পট প্রযুক্তি হলো–

১. ব্লুটুথ (Bluetooth)
২. ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) এবং
৩. ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-MAX)।

১) **ব্লুটুথ (Bluetooth):** স্বল্প দূরত্বের তারবিহীন পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) প্রটোকল যা ডেটা আদান প্রদান করে তাই Bluetooth। অবস্থানের পরিবর্তন হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। এটা একসাথে মোট ৮টি ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এটি চারিদিকে ১০ মিটার ব্যাসার্ধের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে।

➘ ব্লুটুথ এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এটি সাধারণত ২.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
- সাধারণত (১০-১০০) মিটার পর্যন্ত অবস্থিত ডিভাইসগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।
- একসাথে মোট ৮টি ডিভাইস যোগাযোগ করতে পারে।
- ছোট সাইজের ডেটার জন্য বেশি উপযোগি।
- অবস্থান পরিবর্তনের সাথে কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.15.1 ।
- স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের Radio Wave ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদি।

২) **ওয়াই-ফাই (Wi-Fi):** Wireless Fidelity হচ্ছে তারবিহীন দ্রুতগতির এক ধরনের প্রযুক্তির। আর এই Wi-Fi -ই বিশ্ব পর্যায়ে মানুষকে যোগাচ্ছে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সার্ভিস। এটা local area network (LAN) এর ব্যবস্থা। Wi-Fi এর ডেটা ট্রান্সফার রেট 10mbps - 54mbps।

***Wi-Fi এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে- IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers)।

➘ Wi-Fi এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এটি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডে ওয়্যারলেস Local Area Network।
- নেটওয়ার্কে জন্য কোন প্রকার তার এর প্রয়োজন হয় না।

- কভারেজ এরিয়া (৩২-৯৫) মিটার।
- হাফ ডুপ্লেক্সিং মোড ব্যবহৃত হয়।
- Media Access Control (MAC) এর জন্য CSMA/CA প্রটোকল ব্যবহার করা হয়।
- এর কনফিগারে খরচ তুলনামূলকভাবে কম।
- দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও অধিক নিরাপদ।
- যে কেউ সহজে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পারে।
- বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- কভারেজ সীমা সীমাবদ্ধ, ইত্যাদি।

৩) **ওয়াই-ম্যাক্স (Wi-MAX):** Worldwide Interoperability for Microwave Access। এটি IEEE802.16 স্ট্যান্ডার্ডের wireless metropolitan area network (WMAN) প্রটোকল যা ফিক্সড এবং যা মোবাইল ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয়। WiMAX সিস্টেমের দুইটি প্রধান অংশ থাকে।

১. বেস স্টেশন (Base Station)ও
২. এন্টেনসহ WiMAX রিসিভার যা কোন কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সংযুক্ত থাকে।

Wi-MAX এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এটি IEEE802.16 স্ট্যান্ডার্ডের WMAN প্রযুক্তি।
- নেটওয়ার্ক স্থাপন ক্যাবলিংয়ের তুলনায় সহজ এবং সুবিধাজনক।
- অধিক ব্যয়বহুল।
- কভারেজ এরিয়া (১০-৫০) কি.মি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
- নেটওয়ার্ক signal noise কম।
- চ্যানেল ব্যান্ডউইথ 256 স্ব-ক্যারিয়ারের জন্য (1.5-28) MHz পর্যন্ত হতে পারে।
- শতাধিক ব্যবহারকারী একক বেস স্টেশন ব্যবহার করতে পারে।
- WiMAX ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানকারী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি।
- ফুল ডুপ্লেক্স মোড ব্যবহৃত হয়, ইত্যাদি।

১১. কম্‌উনিকেশন সিস্টেম (Communication Systems)

কম্‌উনিকেশন সিস্টেম হলো এমন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে এক স্থানে নির্ভরযোগ্য ভাবে তথ্যে আদান প্রদান সম্ভব। যেমন: E-Mail, E-learning, E-Commerce, Video Conferencing, ইত্যাদি।

Data Communication এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১. Delivery (ডেলিভারি)
২. Accuracy (একিউরেসি)
৩. Timeliness (টাইমলিনেস)।

Data Communication এর ৫টি উপাদান বা অংশ কাজ করে। যথা-

উৎস → প্রেরক → মাধ্যম → প্রাপক → মন্তব্য

ট্রান্সমিশন System

টেলিযোগ সিস্টেমের উদাহরণ-

১. ফোন
২. রেডিও
৪. টেলিগ্রাফ
৫. টেলিভিশন
৭. গ্লোবাল টেলিফোন নেটওয়ার্ক
৮. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট

৩. ইথারনেট ৬. প্রেডিকটিভ ডায়ালারস ও ৯. ইন্টারনেট ইত্যাদি।

টেলিফোন: বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সাথে কথা বলার যন্ত্রই টেলিফোন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রাহম বেল টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক টেলিফোনে সাধারণত দুটো প্রধান অংশ থাকে। যথা-

১। প্রেরক যন্ত্র ও

২। গ্রাহক যন্ত্র। তাছাড়া থাকে সংযোগকারী তার ও একমুখী (ডিসি) বিদ্যুতের উৎস ।

টেলিগ্রাফ (Telegraph): যে যন্ত্রের সাহয্যে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করা হয় তাকে টেলিগ্রাফ বলে। মার্কিন বিজ্ঞানী স্যামুয়েল মোর্স (১৮৩৭) সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন।

সাধারণত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে।

১. প্রেরক যন্ত্র ২. গ্রাহক যন্ত্র ৩. রীলে।

১২. TCP/IP Protocol Suit বর্ণনা করুন। (৩৭তম, ৩১তম বিসিএস)

TCP/IP-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Transmission Control Protocol/Internet Protocol অর্থাৎ ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ আইন বিধি। এ প্রোটোকল স্যুট হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক set rule যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভূলভাবে ডেটা আদান প্রদানে সহায়তা করে। এক কথায়, নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে নির্ধারিত রীতিনীতি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রটোকল।

➘ TCP/IP প্রোটোকল স্যুটকে প্রধানত ৫টি লেয়ারে (Layer) ভাগ করা যায়। যথা-

১. **Application Layer:** এই লেয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ট্রান্সফার, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা পায় এবং ডেটা গ্রহণ করার পর ডেটা ম্যানেজমেন্ট করা ফাইল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

২. **Transport Layer:** এই লেয়ার ডেটার উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের কাজ করে। এক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ছোট ছোট ম্যাসেজ আকারে নির্ধারিত প্রান্তে ট্রন্সমিশন মিডিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রেরণ করা হয়।

৩. **Internet Layer:** বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সিস্টেম থেকে আগত ডেটাকে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়াই এ লেয়ারের কাজ। এই লেয়ার ইন্টারনেট প্রোটোকল মেনে চলে।

৪. **Network Access Layer:** ডেটাকে উৎস হতে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য লজিক্যাল পথ তৈরি করাই এ লেয়ারের কাজ।

৫. **Physical Layer:** এ লেয়ারের কাজ হচ্ছে উৎস হতে গন্তব্য পর্যন্ত ফিজিক্যাল সংযোগ রক্ষা করা এবং কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশনা দেওয়া।

১৩. OSI Model কী? OSI Model এর Layer গুলো বর্ণনা করুন।

এক কম্পিউটার আরেক কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ এর মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য শেয়ার করা। মনে করি দুইটি কম্পিউটার ভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং এই দুইটি কম্পিউটার তথ্য আদান প্রদান করতে চায়। তাহলে একটি কম্পিউটার যখন ডেটা সেন্ড করবে তখন ডেটা অনেকগুলো মিডিয়া হয়ে ডেস্টিনেশন কম্পিউটারে পৌছাবে। সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যাওয়ার সময় ডেটা যেন কোন সমস্যা না হয় মানে ত্রুটি মুক্তভাবে পৌঁছাতে পারে সে জন্য কিছু রুল নির্ধারন করা আছে। এই নিয়মকানুনগুলোকেই বলা হয় প্রটোকল। আর এই প্রটোকলগুলোর সমন্বয়ে যে মডেলটি তৈরি করা হয়েছে এই মডেলটিকেই বলা হয় OSI model।

➘ OSI model কে সাতটি লেয়ার বা স্তরে ভাগ ভাগ করা হয়েছে। এর স্তরসমূহ হলো-

১. **Application Layer:** এই লেয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ট্রান্সফার, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা পায় এবং ডেটা গ্রহণ করার পর ডেটা ম্যানেজমেন্ট করা ফাইল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

২. **Application Layer:** এই লেয়ার নেটওয়ার্ক সার্ভিসের জন্য ডেটা ট্রান্সলেটর হিসেবে কাজ করে। এই লেয়ার যে কাজগুলো করে থাকে ডেটা কনভার্শন, ডেটা কমপ্রেশন, ডিক্রিপশন ইত্যাদি। এই লেয়ারে ব্যবহিত ডেটা ফরম্যাটগুলো হলো জেপিজি, এমপিইজি ইত্যাদি।

৩. **Session Layer:** সেশন লেয়ারের কাজ হলো উৎস এবং গন্তব্য ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা, সেই সংযোগ কন্ট্রোল করে এবং প্রয়োজন শেষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। ডেটা পাঠানোর জন্য ৩ ধরনের কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়। যথা-

ক. সিম্পলেক্স: সিম্পলেক্স এ ডেটা একদিকে প্রবাহিত হয়।

খ. হাফ ডুপ্লেক্স: হাফ ডুপ্লেক্স পদ্ধতিতে একদিকের ডেটা প্রবাহ শেষ হলে অন্যদিকের ডেটা অন্য দিকের ডেটা প্রবাহিত হয়ে থাকে।

গ. ফুল ডুপ্লেক্স: ফুল ডুপ্লেক্স পদ্ধতিতে একইসাথে উভয়দিকে ডেটা প্রবাহিত হতে পারে।

৪. **Transport Layer:** এই লেয়ার ডেটার উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের কাজ করে। এক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ছোট ছোট ম্যাসেজ আকারে নির্ধারিত প্রান্তে ট্রান্সমিশন মিডিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রেরণ করা হয়।

৫. **Network Access Layer:** ডেটাকে উৎস হতে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য লজিক্যাল পথ তৈরি করাই এ লেয়ারের কাজ।

৬. **Data Link Layer:** এটি হলো OSI মডেলের ২য় লেয়ার। ডেটালিংক লেয়ারের কাজ হলো ফিজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটাগ্রামকে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রেরণ করা। এই লেয়ার দুটি ডিভাইসের মধ্যে লজিক্যাল লিংক তৈরি করে। এই লেয়ারে ডেটাকে ফ্রেম এ পরিবর্তন করে।

৭. **Physical Layer:** এ লেয়ারের কাজ হচ্ছে উৎস হতে গন্তব্য পর্যন্ত ফিজিক্যাল সংযোগ রক্ষা করা এবং কিভাবে কাজ করবে তার নির্দেশনা দেওয়া।

১৪. ব্লু-টুথ (Bluetooth) টেকনোলজি সম্পর্কে আলোচনা করুন। (৩৭তম, ৩৬তম বিসিএস)

ব্লুটুথ (Bluetooth): স্বল্প দূরত্বের তারবিহীন পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) প্রটোকল যা ডেটা আদান প্রদান করে তাই Bluetooth। অবস্থানের পরিবর্তন হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। এটা একসাথে মোট ৮টি ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এটি চারিদিকে ১০ মিটার ব্যাসার্ধের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে।

➘ ব্লুটুথ এর বৈশিষ্ট্য/সুবিধা/অসুবিধাসমূহ-

- এটি সাধারণত ২.৪ গিগাহার্টজ ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে।
- সাধারণত (১০-১০০) মিটার পর্যন্ত অবস্থিত ডিভাইসগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।
- একসাথে মোট ৮টি ডিভাইস যোগাযোগ করতে পারে।
- ছোট সাইজের ডেটার জন্য বেশি উপযোগি।
- অবস্থান পরিবর্তনের সাথে কানেকশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
- এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে IEEE 802.15.1 ।
- স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের Radio Wave ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদি।

১৫. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN কি? কয়েকটি LAN এর উদাহরণ দিন। LAN এর উপাদান বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগ ও উপকারিতা লিখুন। (৩০তম বিসিএস)

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network): স্বল্প পরিসরের জায়গায় অর্থাৎ ১০ কি.মি. বা তার কম এরিয়ার মধ্যে কিছু সংখ্যক কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্য কোন পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন-প্রিন্টার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে।

প্রয়োগ: বেশিরভাগ LAN-ই কোনো বিল্ডিং বা দুই তিনটি পাশাপাশি অবস্থিত বিল্ডিং এর মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বড় অফিসে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ডেটা এন্ট্রি, ডেটা প্রসেসিং বা বৈদ্যুতিক মেইলিং এর জন্য LAN ব্যবহৃত হয়। মূলত ওয়ার্কস্টেশনগুলোকে সন্নিবেশিত করা LAN এর কাজ।

➘ LAN এর উপাদানসমূহ-

১. **ওয়ার্ক স্টেশন (Work Station):** ওয়ার্ক স্টেশন শব্দটি ল্যানে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলিকে নির্দেশ করে। এগুলি ল্যান পরিবেশে যৌথভাবে ডেটা ব্যবহার করতে পারে।

২. **সার্ভার (Server):** যে কম্পিউটার ল্যানে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার জন্য ডেটা, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার (প্রিন্টার, প্লাটার ইত্যাদি) সরবারাহ করে সেই কম্পিউটারটিকে সার্ভার বলে। ল্যানে একাধিক সার্ভার থাকতে পারে। নেটওয়ার্ক প্রতিটি সার্ভারে এক একটি নাম থাকে ও ল্যান ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র সেই নামেই সার্ভারগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে।

➘ LAN এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

- ছোট অঞ্চলের মধ্যে ল্যান সীমাবদ্ধ থাকে।
- ল্যান এর পরিবহন মাধ্যম উচ্চ ব্যান্ড উয়িথের (Band width) হয়।
- ল্যান সংযোগ সিরিয়াল পরিবহন পথে করা হয়।
- ল্যান এর ডেটা পরিবহনের হার ১-১০০ মেগাবাইট/সেকেন্ড।

➘ উপকারিতা-

- ➢ খুব সহজে তথ্য ও ফাইল আদান প্রদান করা যায়।
- ➢ বৈদ্যুতিক সিগন্যাল, ডেটা খুব সহজেই স্থানান্তর করা যায়।
- ➢ স্বল্প ব্যয়ে প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ➢ কম্পিউটার ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি পায়।
- ➢ ডিজিটাল সিগন্যাল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

১৬. প্যাকেট সুইচিং এবং সার্কিট সুইচিং- এর উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (৩৬তম বিসিএস)

প্যাকেট সুইচিং (Packet Switching): প্যাকেট সুইচিং নেটওয়ার্ক এক ধরনের নেটওয়ার্ক যেটা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ব্লকে বা প্যাকেটে ডেটা বা তথ্য স্থানান্তর করে। প্রতিটা প্যাকেটের স্থানান্তর হয় তার গন্তব্যের ঠিকানাকার উপর ভিত্তি করে। বেশির ভাগ ইন্টারনেট ডেটা বহন করা হয়ে থাকে নতুন এই পদ্ধতিতে। কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে কোন কিছু ডাইনলোড করা প্যাকেট সুইচিং এর উদাহরণ। এছাড়া ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা-প্যাকেট সুইচিং এর উদাহরণ। প্যাকেট সুইচিং এ মেইল পাঠানোর পরে তা অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এই প্রত্যেকটি খণ্ডকে বলা হয়ে থাকে প্যাকেটর। প্রত্যেকটি প্যাকেটের গায়ে ট্যাগ করা থাকে যে তাদের কথায় যেতে হবে এবং তারা আলাদা আলাদা পথে ভ্রমণ করতে পারে। খণ্ডগুলো যখন তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যায় তখন সেগুলো আবার একত্রিত হয়ে যায়, যাতে তা মেইলরূপে প্রদর্শিত হতে পারে।

সার্কিট সুইচিং (Circuit Switching): সার্কিট এমন এক ধরনের সুইচিং যেখানে নেটওয়ার্কের পয়েন্ট টু পয়েন্ট সংযোগ থাকা জরুরী। অর্থাৎ, যখন দুটি নোড কোনো সার্থক যোগাযোগ মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে তখন তাকে সার্কিট সুইচ বলে। এক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত রুট প্রয়োজন যা থেকে ডেটা প্রবাহিত হবে। সার্কিট সুইচিং এ অবশ্যই সার্কিট গঠিত হতে হবে।

সার্কিট সুইচিং ব্যবহার করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো তিনটি ধাপের মধ্য দিয়ে যায়।

ক) সার্কিট প্রতিষ্ঠা করা; খ) ডেটা ট্রান্সফার; গ) সার্কিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা।

উদাহরণ- ল্যান্ড ফোন ব্যবহার করে কাউকে ফোন করা।

১৭. Band width কি? (৩৮তম, ৩০তম বিসিএস)

➘ ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড (Data Transmission Speed)

এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সমিট করা হয় তাকে bit per second/bps বা bandwith বলে।

➘ Bandwidth এর প্রয়োজনীয় এককসমূহ-

Data Measurement	Size
Bit	Single Binary Digit (1 or 0)

Byte	8 bits
Kilobyte (KB)	$1,024/2^{10}$ Bytes
Megabyte (MB)	$1,024/2^{10}$ Kilobytes
Gigabyte (GB)	$1,024/2^{10}$ Megabytes
Terabyte (TB)	$1,024/2^{10}$ Gigabytes
Nibble	4 bits
Word	16 bits/2 bytes

কমিউনিকেশন গতির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Communication Speed)

↘ Data transmission speed এর উপর ভিত্তি করে তিন প্রকার। যথা–

১. **ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band):** (45-300)bps (bit per second) পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।

২. **ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band):** (1200-9600)bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। টেলিফোন লাইনে বেশি, কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে data স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৩. **ব্রডব্যান্ড (Broad Band):** (1 MB- উচ্চগতি) এটি সাধারণত, optical cable, DSL (Digital Satellite Link), রেডিও লিংকে এবং বর্তমানে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত হয়।

১৮. ক্লায়েন্ট/সার্ভার নেটওয়ার্ক কী? এই নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

যে কেন্দ্রিয় কম্পিউটার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংরক্ষণ করে এবং রক্ষিত রিসোর্স ব্যবহার করে তাকে সার্ভার বলে। নেটওয়ার্কে স্থাপিত যে সকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করে যা শেয়ার করা রিসোর্স সমূহ ব্যবহার করে সে সকল কম্পিউটার ক্লায়েন্ট বলা হয়। সুতরাং একটি রিসোর্স শেয়ার করার জন্য একটি সার্ভার কম্পিউটার ও একটি ক্লায়েন্ট কম্পিউটার প্রয়োজন।

নেটওয়ার্ক সার্ভার তৈরির জন্য কোনো বাড়তি হার্ডওয়্যার প্রয়োজন হয় না, সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। যে কোন কম্পিউটার যেটি এর রিসোর্স শেয়ার করতে চায় তাতে অবশ্যই একটি সার্ভিং প্রোগ্রাম থাকতে হয়। ঠিক একই রকমভাবে ক্লায়েন্ট কম্পিউটারেও রিসোর্স ব্যবহারের জন্য রিসোর্স প্রোগ্রাম থাকতে হয়।

সার্ভার কম্পিউটার ক্লায়েন্টসমূহকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস-সেবা প্রদান করে। যেমন- ডেটা ব্যাকআপ, ফাইল শেয়ারিং, প্রিন্ট সার্ভিস, এপ্লিকেশন/সফটওয়্যার, শেয়ারিং, মেসেজ সার্ভিস, ডেটাবেসস সার্ভিস, ই-মেইল সার্ভিস, নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। সার্ভার হচ্ছে একটি তথ্যভান্ডার যেখানে তথ্য জমা থাকে এবং যখন কোন ক্লায়েন্ট কম্পিউটার তথ্য চায়, তখন সাথে তাকে সেই তথ্য বা ডেটা সরবারাহ করে। প্রতিটি সার্ভার একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যে কোন সার্ভারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো স্টোরেজ মেমরি ও র‍্যাম।